International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.158-169
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.158-169

ধর্মীয় সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা

ডঃ রতন সরকার
সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ (B.Ed.), প্রভাত কুমার কলেজ, কনটাই (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত), কারকুলি, কনটাই, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

তিতাস পান্ডা
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ (B.Ed.), প্রভাত কুমার কলেজ, কনটাই, (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত), কারকুলি, কনটাই, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Raja Rammohan Roy, an eminent individual in the Bengal Renaissance throughout the 19th century, played an indispensable role in the reformation of religion in India. He was an unwavering advocate for social and religious reforms and is frequently referred to as the "Father of the Indian Renaissance." Raja Rammohan Roy emerged as a pivotal figure in the campaign against the practice of Sati, the immolation of widows on their husband's funeral pyres. His endeavors resulted in the enactment of a law prohibiting this practice in 1829. Additionally, he launched a movement against other societal vices such as polygamy and child marriage. Concerning the sphere of religious reformation, Raja Rammohan Roy expressed vocal criticism towards certain aspects of Hinduism, particularly the caste system and idolatry. He advocated for the propagation of monotheism and the examination of rational and ethical facets of Hindu scriptures. Furthermore, he endeavored to instill a spirit of tolerance and understanding among diverse religious communities. Raja Rammohan Roy's exertions laid the foundation for the broader spectrum of social and religious reforms that transpired in India during the 19th and 20th centuries. His legacy endures as a source of inspiration for those who aspire to foster social equity, religious acceptance, and human rights in India and beyond. This article discusses the role of Raja Rammohun Roy in religious reform.

Keywords: Raja Rammohan Roy, Bengal Renaissance, Religious Reformation, Sati Abolition, Social Reform, Monotheism, Hinduism, Caste System, Religious Tolerance, Human Rights.

ভূমিকা: গত বছর রাজা রামোহন রায়ের জন্মের ২৫০বছর পেরিয়ে এলাম আমরা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এদেশের 'প্রথম আধুনিক মানুষ' বলেছিলেন। রামমোহন ভারতবর্ষে নতুন যুগের প্রবর্তক ছিলেন। ১৯৪০ সালে রামমোহনের জন্মশতবার্ষিকী পার করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন-

"হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার ।
মৃত্যু-অন্তরাল ভেদি দাও তবে অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ন তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্ বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।"

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন-'রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্যসত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেজন্য তাহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাহার মানসিক জন্মভূমির বিরোধ তাহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরে নিত্যসত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজন বেশে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনোক্রমেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেজন্য দেশের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিল, তখন বালক রামমোহন মরীচিকা ভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দুর্গম প্রবাসে দেশদেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্যটন করিতেছিলেন। 'রাজা রামমোহন রায় কে 'ভারত পথিক' আখ্যা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজের সফলতা বা প্রচেষ্টার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের কথায় –'রামমোহনের যুগে সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই আধুনিক যুগের প্রকৃতার্থ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ স্বাধীনতা মানবসাধনার উদ্দেশ্য নহে, বরং ব্যক্তিত্বের এবং রাষ্ট্রে সর্বজনীন পারস্পরিক নির্ভরতা সৌভাত্রেরই মানবসভ্যতার চরিতার্থতা। অপরিসীম গভীর জ্ঞান এবং সহজাত আত্মদৃষ্টি সহকারে তিনি মানবতার এই আদর্শ সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্র এবং ধর্মজগতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, কদাপি বস্তুতান্ত্রিক গণ্ডিকে স্বীকার করেন নাই-কদাপি জাগতিক মোহের আকর্ষণে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হন নাই। যে সকল ঋষি যুগ যুগ ধরিয়া ভারতকে নব প্রেরণা ও বল জোগাইয়াছেন, তিনি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কুসংস্কারের অন্ধ তমসা দূরীকরণে তিনি আপন শক্তি নিয়োজিত করেন। তিনি শুধু মানবে মানবে নহে, জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসবান ছিলেন এবং এই বোধই তাহাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মৈত্রীসাধনে সচেষ্ট করিয়াছিল।'

তৎকালীন সমাজ ও ধর্ম: রামমোহন রায় জন্মেছিলেন ১৭৭২ (মতান্তরে ১৭৭৪) খ্রিষ্টাব্দে, হুগলী জেলার ছোট একটি গ্রামে, সাধারণ এক ব্রাহ্মন পরিবারে। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে মেনিনজাইটিস আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। এই সময়ের মধ্যে ভারত তথা বিশ্বের সমাজ জীবনে আলোড়ন ফেলা ঘটনা প্রবাহ বয়ে যায়। এই আলোড়নের ফলে গড়ে ওঠা ঘাত সংঘাত আজ মধ্যযুগের ভারতকে আধুনিক যুগের ভারতে রূপান্তরিত করে তুলেছে। বাংলাদেশে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়েছিল ইসলাম তথা ফার্সি আগমনের মাধ্যমে; আর আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে ইউরোপীয়দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে।

তুর্কি-ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে দ্বাদশ শতাব্দির শেষের দিকে; পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারতের অধিকাংশ তাদের দখলে আসে। মুঘলরা ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে এলেও; কিন্তু আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আসলে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন করে। এর মধ্যেই সমুদ্র উপকূল গোয়াতে পর্তুগিজরা উপনিবেশ বানিয়েছে। ঔরঙ্গজেব ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির মসনদ অধিকার করেন। দক্ষিণ ভারত এ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে

তার মৃত্যু ঘটে, মুঘল সাম্রাজ্যের হাল এমন হয়েছিল যে তার মৃত্যুর ৩০ বছরের ভেতর পারস্যের দস্যু দলের সর্দার নাদির শাহ দিল্লি আক্রমণ ও লুটপাট করে দিল্লি ছারখার করে। তাকে রুখার ক্ষমতা কারোর হয়নি। এই ঘটনার কিছু পূর্বে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ বিদেশী কোম্পানীর ফৌজের কাছে পরাজিত হন। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে বাংলার সুবা বিদেশী সাহসিক এর পদানত হল। "In June 1757, we crossed the frontier and entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal" (Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. -11, p. 499). এরপর ইংরেজ ভারতের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যেই। ভারতবাসীর দণ্ড মুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠেছে।

আলীবর্দী খাঁ মুঘল সম্রাট নিযুক্ত বাংলার সুবাদারকে ধ্বংস করে বাংলার স্বাধীন নবাব হয়ে উঠেছিলেন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। মুঘল সম্রাটের সুবেদারকে হত্যা না করে কিংবা মুঘল বশ্যতা অস্বীকার না করলে তার পক্ষে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসা সম্ভব হত না। এই আলীবর্দী খাঁ এরই দৌহিত্র সিরাজ। সিরাজ কে অপসারণ ও হত্যা করে তার শূন্য সিংহাসন করায়ত্ত করেন নবাবের আত্মীয় এবং সেনাপতি মীরজাফর আলী খাঁ। এই ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ দিল্লি থেকে বিতাড়িত মুঘল সম্রাট তখন এলাহাবাদে সাময়িক আশ্রয়প্রাপ্ত। এই অবস্থায় রবার্ট ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাটের কাছে বাংলার সুবার দেওয়ানী আদায় করলেন স্বল্প অঙ্কের রাজস্বএর বিনিময়ে। বাংলায় শুরু হল শাসন ও শোষনের চরম নৈরাজ্য। বহু রাজকের আধিক্য দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ হিন্দু মুসলমান আর্মিনীয় ফিরিঙ্গি যারা কোম্পানির সঙ্গে সামান্য হলেও যুক্ত বা ছোট বড় মাঝারি কর্মচারী তারা প্রত্যেকে নিজেদের কোম্পানি মনে করতে শুরু করে। কোম্পানির পতাকা তুলে নিঃশুল্ক বাণিজ্য করবার অধিকার দাবি করলে প্রত্যেক কর্মচারী বেনিয়া দালালরা। দেওয়ানী পাবার কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার সমাজ রাজনীতিতে ইংরেজ শক্তি বিপুল ক্ষমতা ধর হয়ে উঠলো। সে নন্দকুমার এর মত সংভ্রান্ত ব্রাহ্মণ হিন্দুকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এনে বিচারের প্রহসন করে এবং ফাঁসিতে লটকে দেয়। তৎকালীন ঠুঁটো সমাজ প্রতিবাদ করার সাহস দেখালে না। কলকাতার জনসাধারণ বিনা দোষে ষড়যন্ত্র করে ব্রাহ্মণ হত্যায় উপবাস করে ও গঙ্গা স্নান করে কাটিয়ে দিল। নন্দকুমারের ফাঁসির বছরে রামমোহন রায় তিন বছর বয়স। ভারত তথা বঙ্গে যখন এইসব কলঙ্কিত অধ্যায় চলছে তখন আমাদের ইউরোপের ঘটনা প্রবাহের দিকে তাকাতে হবে কারণ রামমোহনের চিন্তার ও ভাবনার স্রোত অনেকাংশে পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার জীবিত কালে তিনি ইউরোপ আমেরিকার বহু ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন এবং পরবর্তীতে তার রচনায় এইসব ঘটনা সম্বন্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে হেনভার বংশীয় চতুর্থ জর্জের রাজত্বকালে রামমোহন ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছালেন। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে আর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ৩০ বছরের সময়ে ইংরেজরা বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞান, শিল্পে, দর্শনে সাহিত্যে সব বিষয়েই মধ্যযুগীয়তার অন্ত হয়েছে ইংল্যান্ডেও।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায়ের জন্ম। সেই বৎসর এই ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুই এর রাজত্বকালে ফ্রান্সের বিপ্লবের পটভূমি রচনা হচ্ছে। ১৭৭৪ সালে ষোড়শ লুই রাজা হচ্ছেন পূর্বপুরুষের অন্যায়ের বোঝা মাথায় নিয়ে। ১৭৯২ সালে রামমোহনের বয়স যখন কুড়ি বছর তখন ফ্রান্সের বিপ্লবের আলোড়ন এশিয়ায় এসে পৌঁছেছিল। বিলেতে তখন টমাস পাইনের 'Right of Man' প্রকাশিত হল। তিনি ছিলেন 'French National Convention' এর সদস্য। এই বই প্রকাশের অপরাধে লর্ড কেনিয়নের এজলাসে তাঁর বিরুদ্ধে মামলার শুনানি চলে।। উইলিয়াম বোল্টসনামে একজন ওলন্দাজ বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে ৯০০০০

পাউন্ড উপার্জন করেন। গোল্ড ইংরেজ কোম্পানির লোক না হওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করে ইংল্যান্ড পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৭৭২ সালে তার বই প্রকাশিত হয়। বইয়ের নাম 'Consideration on Indian Affairs'। এই বইটিতে ইংরেজ কোম্পানির কাজকর্ম ও ভারতের সমাজের উপর অত্যাচারের নগ্ন মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় তাঁতিদের আঙ্গুল কাটার যে কাহিনী এখনো প্রচলিত তা এই বোল্ট সাহেবই প্রচার করেছিলেন। এছাড়া Dow সাহেবের লেখা ইতিহাস ও এই অত্যাচারের কাহিনীর সাক্ষ্য দেয়। লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬ থেকে ১৭৯৩) ব্রিটিশ জমিদারি প্রথার অনুকরণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এর ফল হল সাধারণ জনগণের শোষণের জন্য ইংরেজ একদল দেশীয় জনগণকেই নিযুক্ত করলে। লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলাদেশকে পুরোপুরি ইংরেজি আদব কায়দায় আনার চেষ্টা করেন বাংলায় কোম্পানির কাজে প্রচুর ইংরেজ যুবক নিযুক্ত হয়। ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র ভারত থেকে ইউরোপের রপ্তানি করা হয় ১৮১৫ সালে। রামমোহন বিলেতের পার্লামেন্টে ভারত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সেই সময় রপ্তানি বস্ত্রের মূল্য কমে দাঁড়িয়েছিল ১০ লক্ষ টাকায়। এক গজ কাপড় ও ১৮০০ সালে বিলের থেকে ভারতে আসেনি ১৮১৪ সালে প্রথম কাপড় চালান হয়ে এল ম্যানচেস্টার থেকে। ভারতের অর্থনৈতিক কৃষি, কুটির শিল্প এর মতো সামাজিক ভিত্তিগুলি একেবারে ভেঙে পড়ল। এর আগে গ্রাম্য সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সমতা ছিল। তাঁতি বুনতো তাঁত, লোহা পেটাতো কামার, কুমোর পাত্র বানাত, শঙ্খ বনিক গন্ধবণিক, সুবর্ণ বণিক সবাই নিজ নিজ বৃত্তি অনুসরণ করতো। অপরের বৃত্তি নিলে জাত যাবে কিন্তু অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় আগমনে এইসব অর্থনৈতিক ধর্মীয় ভিত্তি ভেঙে পড়ল। তারপর শুরু হল কুখ্যাত নীল চাষ। গ্রামের জীবিকারচ্যুত হিন্দু মুসলমান শহরে চলে এসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দেয়। এদের জীবিকা হয়ে উঠল ঠিকেদারী, দালালি, কোম্পানির চাকুরী। এইরকম একটি মধ্যবিত্ত পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন রামমোহন। রামমোহনের চার পুরুষ নবাবদের চাকুরী করেই ধনবান হয়ে ওঠেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ লগ্নে বড়লাট চাননি ভারতের মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বাধীনতাকামী হয়ে ওঠে।কারণ আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে ইংরেজরা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের পরিবর্তে হেস্টিংস কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্ম প্রচার করতে বিশেষ করে বাংলায় তারা গির্জা কুটি নির্মাণ করে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

মারসম্যান কেরি প্রমুখ ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা ডেনমার্ক অধিকৃত শ্রীরামপুরে মিলিত হয়ে ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন স্থাপন করেন। ধর্ম প্রচারের জন্য এদেশে আসলেও এই মিশন ভাষা সাহিত্যচর্চা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও স্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থা করে। এই মিশন থেকে কেরির বাইবেল অনুবাদ হয়। এদিকে হিন্দু সমাজ জীবনে তখন চলছে চরম অন্ধকারময় হতাশার যুগ। বিশেষ করে হিন্দু নারীদের ইউরোপের ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারার মতই চলছে সতীদাহ প্রথা। রবীন্দ্রনাথের গল্পের মহামায়া তেমনি একটি নারী চরিত্র। স্বর্গ কামনা আসলে ছিল নারীর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার। মিশনারি ও লর্ড ওয়েলেসলি স্বয়ং এই প্রথা কমিয়ে আনার চেষ্টা করলেও দিনের পর দিন তা বেড়েই চলেছিল। এই কালেই ১৯৮৭ সালে রূপ কানুয়ার ১৮ বছর বয়সী মেয়েকে সতী করার জন্য পুড়িয়ে মারার অপরাধ ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেখানে এই প্রথার প্রতি মানুষের কি পাশবিক উৎসাহ ছিল। সে যুগে মেয়েরা সম্পত্তির অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত। পুত্রের পুত্ররা সম্পত্তি পেলেও মা বা মেয়ে কিছুই পাবে না। পরিণাম তাদের থাকতে হবে দাসী হয়ে। ছেড়ে দিলে ভাত কাপড় পাবে না দিলে খাওয়ারও জুটবে না। চরম কষ্টে দিন যাপন করতে হতো নারীদের। সতীদাহের কারণ এই বঞ্চনা ধর্মীয় কারণে সতীদাহ হয়নি। পুত্রের কাছে

লাঞ্ছনা, নিকট আত্মীয়দের কাছে গঞ্জনা, ভবিষ্যতের অন্ধকার নারী জীবনে চরম হতাশা অনেক সময় সতী হতে বাধ্য।

হিন্দু কুলীন ব্রাহ্মণরা নির্বিচারে একের পর এক বিয়ে করছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'পথের পাঁচালীতে' আমরা ইন্দিরা ঠাকরুনের করুন সামাজিক অবস্থার চিত্র দেখতে পাই। সেই সময় তুচ্ছ কারণে স্ত্রী থাকতে তারা আবার বিয়ে করতো। এর ফলে বিধবা হওয়ার পর সেইসব স্ত্রীদের ক্রীতদাসের জীবন কাটাতে হতো। তাদের কুপথে যেতে বাধ্য করতো সমাজ। আরেকটি অপেক্ষাকৃত সম্মানজনক পথ তাদের সমানে খোলা থাকতো-বৃদ্ধ স্বামীর চিতায় উঠে অল্পবয়সেই জীবনবিসর্জন। সব চেয়ে লজ্জাজনক বিষয় হলো এই বিসর্জনকে আত্মীয়স্বজনরা মহান মৃত্যুর তকমা দিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠতো। কত নারী যে বাধ্য হয়ে এই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। অন্য ধর্ম বা সমাজ অর্থাৎ মুসলমান বা কতিপয় সদ্য খ্রীষ্টানদের সমাজ নিয়ে আলোচনার বিশেষ অবকাশ নেই কারণ রামমোহন বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর প্রয়োগ ক্ষেত্র ছিল তৎকালীন অন্ধকারাছন্ন হিন্দু সমাজ।

সতীদাহ সম্পর্কিত তথ্য- ১৮২৩ ক্রিস্টাব্দে পুলিশ বিভাগ বাংলার সরকারকে যে তথ্য দিয়েছিলো তা হলো প্রেসিডেন্সিতে ওই বছর ব্রাহ্মণ জাতির ২৩৪ জন,ক্ষত্রিয় জাতির ৩৫জন, বৈশ্য জাতির -১৪ জন,শুদ্র জাতির-২৯২ জন, মোট ৫৭৫ জন বিধবা সহমৃতা হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ৩৪০ জন কলকাতা কোর্ট অফ সার্কিট বা কলকাতা ও তার আশেপাশের এলাকা। এই ৫৭৫ জনের মধ্যে বয়সের হিসেবে ১০৯ জন ৬০ বছরের বেশী, ২২৬ জন ৪০ ও ষাটের মধ্যে,২০৮ জন কুড়ি থেকে ৪০ এর মধ্যে,৩২ জন কুড়ি বছরের ও নীচে। ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালে মোট ১৪ বছরের মধ্যে কলকাতা বিভাগে ৫১১৯ জন সতী হন,ঢাকা বিভাগে ২৬৭ জন,১৪ বছরে মোট ৮১১০ জনের মৃত্যু হয়েছিলো। এক ইংরেজ, জে পেগস ১৮২৮ সালের ৯ই মার্চ একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। বইটির নাম – "Suttees Cry To Britain"। বল পূর্বক সতীদাহের অনেক মর্মভেদী কাহিনী বইটিতে উল্লেখ আছে (মুখোপাধ্যায়, ১৯৯০)।

ধর্ম সংস্কারে রামমোহনের অবদান: ১৮১৮ এবং ১৮১৯ সালে সতীদাহ প্রসঙ্গে দুটি বাংলা পুস্তক, রামমোহন বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেন। পুস্তকের নাম 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের প্রথম সংবাদ' এবং 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ'। দ্বিতীয় পুস্তকের ইংরেজি ভাষায় অনুবাদটি রামমোহন হেস্টিংস পত্নীকে উৎসর্গ করেন। রামমোহন সংবাদ কৌমুদী নামক সংবাদ পত্রিকায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। সতীদাহ বন্ধ করার জন্য ১৮১৯ সালে সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান। ১৮০৫ সাল থেকেই ইংরেজ সরকার সতীদাহ প্রথার নিবারণের ইচ্ছা দেখালেও তাদের শাসনকার্য ও ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটবে এই ভয়ে হিন্দু মুসলমানের কোনো ধর্মীয় প্রথায় তারা হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে।

এরপর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতে শাসক হয়ে এলেন। সতীদাহ প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ, ইংল্যান্ড এর কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এর কাছ থেকে নিয়েই ভারতের শাসনের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৮২৯ সালে বেন্টিঙ্ক এর ভারতের শাসনভার গ্রহণের এক বছর পরে রামমোহন লিখলেন সহমরণ বিষয়। সমাচার দর্পন পত্রিকা লিখলো- রামমোহন প্রমান করেছেন যে ঠিকঠাক বিচার করলে শাস্ত্রে সহমরণ বিষয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। বেন্টিঙ্ক এই কু-প্রথাকে নির্মূল করার জন্য রামমোহনের সাহায্য চাইলেন, তখন রামমোহন বেন্টিঙ্ককে এবং অন্যান্যদের এই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সচেতন করলেন। তিনি

সতীদাহকে কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা মনে করেননি। নারীর অধিকারের সাথে এই প্রথার যোগ আছে। তিনি শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে দেখালেন ভারতের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে নারীর ন্যায্য অধিকারকে কখনো অস্বীকার করা হয়নি।

বৃহস্পতি, বিষ্ণু, নারদ, কাত্যায়নি, যাগ্যবল্ক সকলেই বলেছেন স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলের সঙ্গে মা স্বামীর সম্পত্তির সমান অধিকার পাবে। এমনকি মনুও তার 'দায়ভাগ' গ্রন্থে নারীর অধিকার কে স্বীকার করেছেন।

রক্ষণশীল সমাজের তখন যায় যায় অবস্থা। ভবানীচরণ বন্ধ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় এই আইন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লেখা চলতে লাগল। বেন্টিঙ্ক এর কাছে তারা আর্জি জানালেন ওই পথে যেন তিনি না যান, এতে হিন্দুর হিন্দুয়ানিতে আঘাত দেওয়া হবে। এদিকে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ রামমোহনের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। আলোড়ন উঠলো কলকাতার বুকে এইরকম আলোড়ন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইনের সময় ও উঠেছিল পরবর্তীকালে দেখতে পাই। অবশেষে রামমোহন রায় জয়ী হলেন ১৮২৯ সালে, সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়ে এলো। রক্ষণশীল সমাজের এই পরাজয় গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতরা এই আইনকে মেনে নেবেন কেন? তারা আটশ প্রভাবশালী মানুষের সই সংগ্রহ করলেন। তবুও যখন আইন পাস হয়ে গেলো তখন বিলেতে প্রিভিকাউন্সিলে আর্জি জানাও। রাধাকান্ত দেব, মহারাজ গোপীকৃষ্ণ, হরনাথ তর্কভূষণ, দেওয়ান রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেছিলেন। 'স্বধর্ম ও সদাচার সদ্ববহারাদি রক্ষার্থ' ধর্মসভা স্থাপন করে ভবানীচরণ রামমোহনের প্রতিবাদে আরো ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সতীদাহ প্রথার নিবারণের আইন এর বিরুদ্ধে হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করার জন্য এই সভা স্থাপন করা হয়। এই সভার উদ্দেশ্যে নাস্তিকদের শাস্তিদান ও ছিল। এর আগে রামমোহন ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৮২৮ সালে। এই সভার উপাসকদের নাস্তিক বলেছিলো ধর্মসভা। ধর্মসভা ঠিক করে ফেললো অ্যাটর্নি ফ্রান্সিস বেথিকে পাঠাবে ইংল্যান্ডএ প্রিভিকাউন্সিলে। এর জন্য তো টাকা দরকার। ভালো কাজে টাকা পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু এসব দুস্কর্মের জন্য তৎকালীন সময়ে চাঁদা উঠলো কুড়িহাজার টাকা। কিছুক্ষেত্রে জুলুম করেও চাঁদা তোলা হল। এখানেই তারা চুপ রইলেন না। গুন্ডাবাহিনী নামানো হল রামমোহনকে খুন করার জন্য। রামমোহন করবেন কি? তাকে বডিগার্ড এর ব্যবস্থা কে করবে? রামমোহন নিজের সঙ্গেই রাখতে শুরু করলেন গুপ্তি নামে একরকমের গুপ্ত অস্ত্র। তার শরীর যেমন ছিল যথেষ্ট কর্মক্ষম মনের জোর ও ছিল অনেক। এদিকে রামমোহনকেও বিলেতে পাঠাবার ব্যবস্থা করল ব্রাহ্মসভা। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। বন্ধুর উৎসাহে রামমোহন খুশি হলেও নিজে না নিয়ে এই দেন তিনি ব্রাহ্মসভাকে দান করে দিলেন। ঠিক করলেন বিলেত যেতে গেলে নিজের টাকাতেই বিলেত যাবেন। সুযোগ এসে গেলো তখন, যখন রামমোহন টাকার ব্যাপারে চিন্তিত। ভারতে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রায় স্থায়ী হয়েছে। কিন্তু তখনও দিল্লিতে একজন বাদশাহ ছিলেন -দ্বিতীয় আকবর, নামেই বাদশাহ। দ্বিতীয় আকবর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে কিছু দাবি নিয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানি তার আবেদন তার আবেদন নাকচ করে দেন। তিনি অবশেষে ইংল্যান্ড এর রাজার কাছে একজন দূত পাঠাবেন বলে ঠিক করলেন। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষে রামমোহনই ছিলেন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে আরবি-ফার্সি, সংস্কৃততে পণ্ডিত, সওয়াল জবাবে পারদর্শী, ইংরেজি বলিয়ে এমন তুখোড় লোক আর কোথায়? রাজা উপাধি দিয়ে দ্বিতীয় আকবর রামমোহনকে বিলেতে পাঠাতে চাইলেন। সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন রামমোহন। রামমোহনের দাদার চিতায় সতী হয়েছিলেন বৌদি। সংকল্প করেছিলেন

বৌদিকে বাঁচাতে পারেননি কিন্তু তাকে এই বর্বরতা বন্ধ করতেই হবে। কিছু দিনের ভেতরেই প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ বিল নিয়ে আলোচনা হবে।সুতরাং আর দেরি করা ঠিক হবে না। বিলেতে তাঁকে যেতেই হবে। এদিকে কোম্পানির কর্তারা তাঁকে রাজা বলে মানলেন না। রামমোহনের বিলেত যাত্রায় বাদ সাধলেন বড়কর্তারা। নামেই দিল্লির বাদশা তাকে মানে কি? অগত্যা রামমোহনকে কোম্পানির শাসন মানতে হলো। তিনি সাধারণ মানুষ হয়েই বিলেত যাত্রা করবেন। সিংহাসনে বসে রাজা নয়, ভারতের নিষ্ঠুর অত্যাচারে অত্যাচারিত নারী সমাজের কাছে তিনি তখন বেতাজ সম্রাট। কোম্পানির কাছে তো নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের হুমকির মুখে পড়তে হলো রামমোহন রায় কে হুমকি হলো রামমোহনকে এক ঘরে করতে হবে। রামমোহন তাতেও ভয় পেলেন না। অ্যালবিওন জাহাজ চড়ে রামমোহন ১৮৩০ সালে বিলেত পাড়ি দিলেন। কে জানত ভারতের মাটিতে তার আর পদচিহ্ন পড়বে না? এদিকে রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধি বেথির জাহাজডুবি হল। তুফানে দলিল দস্তাবেজ কাগজপত্র গেল ভেসে। কোনক্রমে প্রাণ বাঁচালেন বেথি। শুধু সতীদাহ প্রথা রদি নয় ভারত সম্পর্কে আরও অনেক কিছু পাশ্চাত্যকে জানাবার আছে রামমোহনের। সেকালে জাহাজে ইংল্যান্ড পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লেগে যেত। জাহাজ এসে কেপটাউনে পৌঁছলো। এখানে একটি দুর্ঘটনা ঘটলো। পড়ে গিয়ে রামমোহনের একটি পা ভেঙে গেল। সেই ভাঙা পা তার আর কোনদিনই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি। সেই সময় ফ্রান্সের বিপ্লব ইউরোপে সাড়া ফেলেছিল। স্পেনের দাসত্ব থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলি মুক্ত হচ্ছে। যেখানেই স্বাধীনতার প্রকাশ সেখানেই রামমোহনকে আনন্দিত হতে দেখতে পেয়েছি। সংগ্রামীদের সঙ্গে রামমোহন যে আত্মিক আত্মীয়তা অনুভব করেছিলেন সে ছিল ভারতের বিশ্ব প্রেম। বিশ্বের পরাধীন মানুষদের ঐক্যের বার্তা রামমোহনের কথায় ও কাজে সূচিত হয়েছিল। ইউরোপের রাজশক্তিগুলির রাষ্ট্রদূতের আসন দেওয়া হলো রামমোহন কে? এবার সতীদাহ আইনে ফিরে আসি। সতীদাহ আইন করে বন্ধ হওয়ার বিলটি কমনসভায় পাশ হলেও লর্ডসের সভায় নাকজ হয়ে যাচ্ছিল। ইংল্যান্ডের সাধারণ জনগণও অধীর আগ্রহে বিলটির পরিনাম সম্বন্ধে অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে তৃতীয় দফায় বিলটি যখন লর্ডসের সভায় প্রেরণ করা হলো তখন বিলটি পাস হয়ে গেল। রামমোহন উইলিয়াম রাথবোনকে চিঠিতে লিখে তার আনন্দ প্রকাশ করলেন। ব্রিটিশ সরকার রামমোহনের রাজা উপাধি স্বীকার করলেন। রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ হলো। দ্বিতীয় আকবরের বাৎসরিক অনুদান তিন লক্ষ টাকা বাড়ানো হলো। রামমোহন যথাসাধ্য করলেন, রামমোহনের অকাট্য যুক্তির সামনে রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধি বেথির সাওয়াল টিকতেই পারল না। যে হিন্দু সমাজের বদ্ধ স্রোত থেকে কচুরিপানা সরিয়ে দিতে উদ্ধত হয়েছিলেন রামমোহন সেই হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলরাই বাদ সাধলেন। 'পাষণ্ড পীড়ন' নামে একটি বই প্রকাশ হলো ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে। ২৩৮ পৃষ্ঠার এই বইয়ের জবাব রামমোহন দিলেন পথ্যদান প্রকাশ করে। রামমোহনের ঘোর বিরোধী ছিলেন নন্দলাল ঠাকুর। কাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন 'পাষণ্ড পীড়ন' বই রচনা করেছিলেন। রামমোহনের প্রতি কটু বাক্য গালিগালায় পূর্ণ ছিল এই বই। রামমোহনের মতে বেদান্ত ও কুরআনে এমন কিছুই ছিল না যার দ্বারা অলৌকিক প্রত্যাদেশ ও অনৈসর্গিক ক্রিয়ার বিশ্বাস এবং কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রামমোহন-জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে আরব দেশীয় মতাজল সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ ও ইউরোপের অষ্টাদশ শতকের শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তিমূলক গ্রন্থগুলি রামমোহনের ধর্ম সংস্কারের যুক্তিগুলি তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মতাজল সম্প্রদায়ের মূল বক্তব্য ছিল ঈশ্বর অনন্ত অনাদি কিন্তু এসো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান এগুলি ঈশ্বরের গুণ নয়। যদি এইগুলি ঈশ্বরের গুণ বলে ধরা হয় তবে ঈশ্বর

নিজের গুণের অধীন হয়ে যান। ঈশ্বরের গুণগুলি যতই পৃথকভাবে ভাবা হয় ঈশ্বর তত খন্ডিত হবেন। মতাজলরা মনে করতেন মানুষ নিজের কর্মের দ্বারাই পরিত্রাণ পাবেন। এইসব যুক্তির রামমোহন মানতেন কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ রামমোহনের যেমন বিরোধিতা করেছিলেন তেমনি খ্রিস্টান মিশনারীও রামমোহনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ১৮ শতকেই থেকেই মিশনারিরা হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমণ শুরু করেন। হিন্দু ধর্মকে পতিদের ধর্ম বলেছিলেন মানোএল দা আসুমপ সও এবং দোম আন্তনীয়। রামমোহন ও মিশনারীরা পৌত্তলিকতা বিরোধী। এই কারণে এক সময়ে রামমোহনের সঙ্গে মিশনারীদের খুব বন্ধুত্ব ছিল। খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বতে যে রামমোহনও বিশ্বাসী এই মিথ্যে তারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিল। বিদেশেও সে সময় রামমোহনের ধর্মমত নিয়ে আলোচনা চলেছে। রামমোহন 'The Precept of Jesus: Guide to Peace and Happiness'(১৮২৪) বইটি প্রকাশ করলেন। অমনি আগুনে ঘি পড়ল। রামমোহন জোর দিয়ে বললেন বাইবেলের অলৌকিকতা ও যীশুর ঈশ্বরতাকে মানা যায় না-

"পাত্র: তিনজন চীনদেশীয় শিষ্য ও পাদরি

পাদরি: ঈশ্বর এক না অনেক?
প্রথম শিষ্য ঈশ্বর তিন।

দ্বিতীয় শিষ্য: ঈশ্বর দুই।
তৃতীয় শিষ্য। তোর নেই।

পাদরি: (হতাশ) হায় হায় তোমরা শয়তানের কাজ করলে।
তিনজন শিষ্য একসঙ্গে: আপনি তো এইরকমই শিখিয়েছিলেন।

পাদরি: ওহে তুমি যে তিনজন ঈশ্বরের কথা বলছ তা আধা আধা ভাবে সত্য। মনে রেখো তিনজন মিলে এক ঈশ্বর।

প্রথম শিষ্য: আমরা চীন দেশের লোক। তিনকে এক করতে জানিনা।

পাদরি: তুমি মূর্খ, ওহে দ্বিতীয় শিষ্য তুমি ঈশ্বর দুই বললে কেন?

দ্বিতীয় শিষ্য: আপনি যে বলেছিলেন তিনজনের মধ্যে একজন পশ্চিমে গিয়ে মারা গিয়েছেন, তাহলে তো থাকে দুইজন।

পাদরি: মূর্খ! ওহে তৃতীয় শিষ্য তুমি কি মনে করে বললে ঈশ্বর নেই?

তৃতীয় শিষ্য: আমি আপনার কথা শুনে বুঝেছিলাম ঈশ্বর এক।

পাদরি: তাহলে তুমি ঈশ্বর নেই বললে কেন?

শিষ্য: দেখুন আমার হাতের এই জিনিসটিকে যদি অন্য স্থানে সরিয়ে দি তবে আমার হাতে কিছুই নেই।

পাদরি: এইরকম যুক্তি এখানে কিভাবে আসছে?

শিষ্য: যীশু ঈশ্বর আপনি বলেছিলেন, তিনি তো আজ থেকে ১৮০০ বছর আগেই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন, তাহলে কি প্রমাণ হয় বর্তমানে ঈশ্বর নেই।

পাদরি: তোমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করব কিন্তু জানবে যতদিন বাঁচবে ততদিন কেবল যন্ত্রণা পাবে"।

(রাজা রামমোহন রায়, বিজিত কুমার দত্ত, ১৯৯৭, প.২৫)

কিভাবে রামমোহন নাটকের মাধ্যমে, রসিকতার মাধ্যমে ঠাট্টার ছলে বাইবেলের তিন ঈশ্বর এ বিশ্বাসকে দেখিয়েছিলেন। আমাদের সুবিধের জন্য নাটকের ভাষাকে কিছুটা সময়োপযোগী করে নিলাম। তিন ঈশ্বর বলতে খ্রিস্টানরা যে তিনজন ঈশ্বরের কথা বলেছেন যেমন গড, যীশু, হলি ঘোস্ট। এসব কে রামমোহন তীব্র সমালোচনা করেন। এইজন্য গোড়া মিশনারিরা রামমোহনের উপর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে খ্রিস্টান মুসলমান ও গোঁড়া হিন্দুরা রামমোহনের উপর রুষ্ট হন। অতীন্দ্রবাদীরা, থোরো সাত সমুদ্র পার এ বসে রামমোহনের চিন্তাভাবনায় মুগ্ধ হচ্ছেন। এম. ডি. কনয়ে অনেক কাল পরেই সেই ইউনিটেরিয়ান কমিটি সম্পর্কে বলেছেন এই হিন্দু ধর্মচিন্তাবিদের জুরি খ্রিস্টান জগতেও মেলা ভার। বিলেতে রামমোহনের সভা এতই বিখ্যাত হয়েছিল যে ফ্রান্স ট্রানসিলভেনিয়া থেকে একেশ্বরবাদীরা, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি বার্কল্যান্ড রামমোহনের কাছে এসে পৌঁছে ছিলেন। এ যেন মার্টিন লুথারের মত খ্রিস্ট ধর্মের অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।রামমোহন দেশ কালের ব্যক্তিগত পদাধিকারের বেড়াজাল কাটিয়ে বিশ্বজনের এক ধর্মকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু ইসলাম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকল ধর্মের মূল সত্যকে সন্ধান করেছিলেন। তার নিজের মতো করে সফল হয়েছিলেন। খ্রিস্টানদের গালিগালাজের উত্তরে রামমোহন বলেছিলেন 'ঈশ্বর ধর্মকে সেই শক্তি দিন যাতে মানুষে মানুষে ভেদ বিভেদের মনোভাবের শেষ ঘটিয়ে তা মানবজাতির শান্তির ও ঐক্যের উপযোগী হয়।'

ব্রাহ্মসমাজ: "কে ভুলাল হায়/ কল্পনাকে সত্যি করি জান, একি দায়/ আপনি গড়ছ যাকে, / যে তোমার বশে তাঁকে / কেমন ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়? /কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার; / ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার। /প্রভু বোলে মান যারে, / সম্মুখে নাচাও তারে।---/ হেন ভুল এ সংস্কারে দেখেছো কোথায়?"

(রাজা রামমোহন রায়, বিজিত কুমার দত্ত, ১৯৯৭, প.২৫)

আত্মীয় সভাতে রামমোহন রচিত এ সংগীত গাওয়া হত। নতুন একটি প্রবাহ যুক্ত হল কীর্তন পাঁচালী রামপ্রসাদী গানের সঙ্গে। তার নাম হল ব্রহ্মসঙ্গীত। রংপুরে থাকাকালীন ডিগবীর দেওয়ান রামমোহন, নিজস্ব ছোটখাটো একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। এখানে রামমোহন স্বদেশের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি কলকাতায় চলে আসেন ১৮১৪ তে। অল্পদিনের মধ্যে রামমোহন বিত্তশালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি সুপুরুষ, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান দীপ্ত উপস্থিতি সম্ভ্রান্ত সমাজে স্থান করে নিতে বেশিদিন দেরি হলো না। ১৮১৫ সালে কলকাতার গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকা নাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী,নন্দকিশোর বসু,বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজ মোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার, প্রমুখ ও বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে তৈরি করলেন আত্মীয় সভা। রামমোহন সমমনস্ক বন্ধুদের আত্মীয় বোধ করতেন। তাই সভার এমন নামকরণ। অল্পদিনের মধ্যেই এই আত্মীয় সভা কলকাতায় আলোড়ন তুললে। আনুষ্ঠানিক ব্রত উৎসব পালন করা বিধান দিয়ে শান্ত নিশ্চিন্তে থাকা রক্ষণশীল সমাজের তাসের দেশ এই নতুন হাওয়ায় অশান্ত হয়ে উঠলো। রামমোহনকে মৃত্যুঞ্জয় বললেন ন্যাবার চিকিৎসায় তিনি ঘোড়ার রোগের প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনকে পাষণ্ড আখ্যা দিলেন। আত্মীয় সভায় কিন্তু শাস্ত্র আলোচনা বেদ পাঠ ব্রহ্ম সংগীত গীত হতে লাগলো। শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করতেন। লোকনিন্দে অসহ্য হলে কয়েকজন আত্মীয় এই সভা এড়িয়ে

চলতে লাগলেন। এই সভার সদস্যদের নাস্তিক বলে দেখে দেওয়া হল। এই সভা কখনো বসতো রামমোহনের বাড়িতে কখনো সিমলা ষষ্ঠী তলায় আবার কখনো মানিকতলায়। এরপর রামমোহন পৈত্রিক সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় কিছুদিন ব্যস্ত ছিলেন।তখন এই শহর অধিবেশন বস্তু কখনো বৃন্দাবন মিত্রের বাড়িতে কখনো কালীশংকর ঘোষালের বাড়িতে কখনো বিহারীলাল চৌবের বাড়িতে। এই সময় প্রায় দু বছর আত্মীয় সভার বৈঠক বন্ধ রইলো। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ৯ জুন সুতারুটির কালীপ্রসাদ কর মহাশয়ের কাছ থেকে একটি ইমারত সহ চার কাঠার কিছু বেশি জমি ৪২০০ টাকায় রামমোহন দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্ন কুমার ঠাকুর কালীনাথ রায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীসের নামে ক্রয় করা হলো। যেখানে ব্রহ্ম উপাসনার কাজ চলতে পারে। দলিলে উল্লেখ আছে যে সুতানুটি গ্রামের মধ্যে চিৎপুর রোড সংলগ্ন এলাকায় এই জমি ও ইমারত অবস্থিত ছিল। তা ব্রাহ্মসমাজের নিমিত্তিক ক্রয় ও বিক্রয় করা হইল। এই বাড়িতেই ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের কার্য আরম্ভ হয়। ঐদিন একজন মাত্র ইউরোপীয় সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি হলেন মন্ট গমারী মার্টিন। তিনি তার লিখিত বই 'History of The British Colonies' এ উল্লেখ করেন ১৮৩০ সালে এই সমাজ রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পুস্তকের লেখক তখন তার সঙ্গেই ছিলেন। রামমোহন কখনো নিজেকে অহিন্দু বলেননি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন ব্রাহ্মরা অহিন্দু নয়। পরিচয় প্রবন্ধ গ্রন্থে আত্মপরিচয় দ্রষ্টব্য।

উপসংহার: রাজা রামমোহন রায়, 19 শতকের ভারতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, প্রায়ই একজন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবে বিবেচিত হন। ধর্মীয় সংস্কারে তাঁর প্রচেষ্টা এবং অবদান ভারতীয় সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। রামমোহন হিন্দুধর্মের মধ্যে একেশ্বরবাদের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি এক পরম ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন এবং সময়ের সাথে সাথে হিন্দুধর্মে প্রবেশ করা বিভিন্ন বহু-ঈশ্বরবাদী প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে হিন্দু ধর্মের সারমর্ম একেশ্বরবাদী এবং এক ঈশ্বরের উপাসনার মধ্যে নিহিত। ধর্মীয় সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল মূর্তি পূজার তীব্র বিরোধিতা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজার কোনো স্থান নেই এবং এটি ধর্মের অপবিত্রতা। তিনি মূর্তি পূজা থেকে মুক্ত হিন্দুধর্মের একটি রূপ প্রচারের জন্য কাজ করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় যুক্তি ও যুক্তিবাদের একজন দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন। তিনি ধর্মীয় গ্রন্থ এবং অনুশীলনের একটি সমালোচনামূলক পরীক্ষাকে উৎসাহিত করেছিলেন, ধর্মের প্রতি আরও যুক্তিযুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচার করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্ম অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তি ও যুক্তির ভিত্তিতে হওয়া তিনি সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন এবং বাল্যবিবাহ, নারীর অধিকার ও কল্যাণের পক্ষে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীদের শিক্ষার সুযোগ এবং তাদের জীবন সম্পর্কে পছন্দ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। রায় খ্রিস্টান এবং ইসলাম সহ বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের পণ্ডিতদের সাথে অর্থপূর্ণ কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অভিন্ন ভিত্তি খোঁজেন। রায় একটি সংস্কারবাদী ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য হিন্দুধর্মের মধ্যে একেশ্বরবাদ, যুক্তিবাদ এবং সামাজিক সংস্কারের প্রচার করা। এটি ভারতে একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও দার্শনিক আন্দোলন হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় সংস্কারের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। তিনি স্কুল এবং প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেগুলি আধুনিক এবং যুক্তিযুক্ত শিক্ষা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। তিনি শিক্ষাকে তার সংস্কারবাদী ধারণা

ছড়িয়ে দেওয়ার এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার মাধ্যম হিসেবে দেখেছিলেন। একজন ধর্মীয় সংস্কারক হিসাবে রায়ের অবদানগুলি গোঁড়া চর্চাকে চ্যালেঞ্জ করার এবং ভারতে ধর্মের প্রতি আরও যুক্তিযুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির প্রচারে সহায়ক ছিল। তার কাজ দেশে পরবর্তী ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ মাঘোৎসবে রামমোহনের স্মরণে লিখলেন-

"নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।"

তথ্যসূত্রঃ

1) Bolts William. Considerations on India Affairs. London: J. Almon. (1772).
2) Dow Alexander. The History of Hindostan. London: T. Becket and P. A. De Hondt. (1779).
3) RPH Editorial Board. Biography of Raja Ram Mohan Roy: Social Reformer Maker of Modern India. New Delhi: Ramesh Publishing House. (2020).

4) Sarkar, Jadunath. History of Bengal. Vol. No. 11. (1943).
5) কোপস, ডি. এবং রবার্টসন, বি. সি.। রাজা রামমোহন রায়: আধুনিক ভারতের জনক। আমেরিকান ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, ১০২(১),n ১৬১। (১৯৯৭, ফেব্রুয়ারি)। https://doi.org/10.2307 /2171367
6) চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ । মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।(১৮৮৯)।
7) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ভারত পথিক ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ - রবীন্দ্র রচনাবলী। (অজ্ঞাত)। Available at: https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1.
8) ড. অজিতকুমার ঘোষ। রামমোহন রচনাবলী, আবদুল আজীজ আল্-আমান হরফ প্রকাশনী, কলকাতা। (১৯৭৩)।
9) মন্ডল, জি.। রাজা রামমোহন রায়: আধুনিক ভারতের রেনেসাঁর জনক। গবেষণা পর্যালোচনা ইন্টারন:্যাশানাল জার্নাল অফ মাল্টিডিসিপ্লিনারি, ৮(৮), ১৫৪-১৫৮ (২০২৩, আগস্ট১৪)। Available at: https://doi.org/10.31305/rrijm.2023.v08.n08.026.
10) মুখার্জি, পি.। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা। (১৭৭২-১৮৩৩)। ভারতীয় বিজ্ঞান ক্রুজার, ৩৬(২),৪০.।(২০২২,জুন)।
Availableat:https://doi.org/10.24906/isc/2022/v36/i2/212545.
11) মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য।(১৩৩৯ সন)।
12) শ্রী ভূষণ চন্দ্র মন্ডল । ভারত পথিক রাজা রামমোহন, চক্রবর্তী প্রকাশনী, কলিকাতা। (অজ্ঞাত)।
13) সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খন্ড,নবম সংস্করণ), আনন্দ, কলকাতা। (১৪১৮)।